ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1016-1023
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.318

ঔপনিবেশিক বাংলায় শ্রমিক চেতনার মুখপাত্র: বিশের দশকের ‘সংহতি’ পত্রিকার একটি বিশেষ পাঠ

মস্তাফিজুর আলম, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 07.03.2026; Accepted: 10.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The 1920s stand as a landmark era in the social, political, and economic history of Bengal. Inspired by the post-World War I global economic depression, inflation, and the success of the 1917 Russian Revolution, an unprecedented awakening emerged among the working class in India's industrial belts. In particular, there was a pressing need to give a structured political form to the spontaneous grievances of workers in Kolkata and its adjacent jute mill areas. During this critical juncture, a significant section of the educated, socially conscious middle-class intelligentsia directly involved themselves in the labor movement. Their primary objective was to sensitize the neglected laborers and employees regarding their legitimate rights and to build a robust trade union or labor organization to secure those rights.

The contemporary periodicals served as one of the primary instruments of this organizational endeavor. In the early 1920s, specifically between 1921 and 1924, several labor-friendly magazines were published from Kolkata, among which 'Sanghati', are particularly noteworthy. These periodicals did not merely disseminate news; they provided theoretical and practical direction to foster a distinct 'Labor Consciousness' among the working class. How these magazines determined the course of the labor movement amidst the political turmoil of that time, and specifically how 'Sanghati' conveyed the messages of 'Class Collaboration' and 'Labor Liberation' to the common people, is the central theme of this essay. This research is primarily based on the editorial comments and archival records of the original 1920s periodicals, presented here as a documented testament to the struggle of the working class in Bengal.

Keywords: Labor Movement, Sanghati Magazine, Trade Union, Class Collaboration, The Twenties (1920s), Santosh Kumari Devi, Industrial Politics, Nationalism, Periodicals, Economic Depression, Press Employees' Association, Labor Consciousness, Hunger Strike of Political Prisoners, Labor Laws, Cooperative Movement, Bureaucratic Interference

‘সংহতি’ পত্রিকার আবির্ভাব ও সাংগঠনিক ভিত্তি:

ঔপনিবেশিক বাংলায় ১৯২০-এর দশকের সূচনা পর্বটি ছিল নানাবিধ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনে কণ্টকিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতির করাল গ্রাসে বাংলার শ্রমজীবী মানুষের জীবন যখন ওষ্ঠাগত, ঠিক সেই সময় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) বৈশাখ মাসে ‘সংহতি’ পত্রিকার জন্ম

হয়। এই পত্রিকার আবির্ভাব কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না; বরং এটি ছিল তৎকালীন ক্রমবর্ধমান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এক সুপরিকল্পিত বুদ্ধিবৃত্তিক বহিঃপ্রকাশ। পত্রিকাটির প্রকাশনার মূল চালিকাশক্তি ছিল 'প্রেস কর্মচারী সমিতি'। মূলত মুদ্রণ শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের অধিকার রক্ষার তাগিদ থেকেই একটি নিজস্ব মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল, যার সফল রূপায়ন ছিল এই 'সংহতি'।

পত্রিকাটির সম্পাদনার গুরুভার গ্রহণ করেছিলেন জ্ঞানাঞ্জন পাল এবং মুরলীধর বসু। তবে এর নেপথ্যে প্রধান সাংগঠনিক কারিগর হিসেবে কাজ করেছিলেন জিতেন্দ্র নাথ গুপ্ত। এই ব্যক্তিবর্গ কেবল সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন তৎকালীন সমাজ-চেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি, যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে শ্রমিকদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে হলে তাঁদের হাতে কলম তুলে দিতে হবে। 'সংহতি'র সাংগঠনিক ভিত্তিটি ছিল অত্যন্ত মজুত, কারণ এটি সরাসরি একটি শ্রমিক সংগঠনের আদর্শকে ধারণ করত। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, অবহেলিত ও শোষিত শ্রমিক শ্রেণিকে তাঁদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করাই এর প্রধান লক্ষ্য।

এই পত্রিকাটির সাংগঠনিক কাঠামোর অন্যতম বিশেষত্ব ছিল এর শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। পরিচালকরা মনে করতেন, কেবল রাজপথে আন্দোলন করলেই শ্রমিকদের মুক্তি আসবে না; তাঁদের মধ্যে লেবার কনশাসনেস (শ্রমিক চেতনা) জাগ্রত করা অপরিহার্য। এই চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য 'সংহতি' তার পাতায় নিয়মিতভাবে শিল্প আইন (Labour Laws) এবং বিভিন্ন আইনি সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করত। তৎকালীন ব্রিটিশ আমলের জটিল শ্রম আইনগুলো সাধারণ শ্রমিকদের বোধগম্য করে তোলার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল অতুলনীয়।

সাংগঠনিক কার্যক্রমে 'সংহতি' কেবল একটি সংবাদপত্রের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে শ্রমিকদের জন্য একটি আদর্শিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করত। পত্রিকাটির মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনের (Cooperative Movement) গুরুত্ব ব্যাপকভাবে প্রচার করা হতো। উদ্যোক্তারা বিশ্বাস করতেন, শ্রমিকরা যদি সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে পারে, তবে মালিক পক্ষের শোষণ থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ হবে। এই সমবায়মুখী চিন্তা ও সাংগঠনিক দৃঢ়তা 'সংহতি'কে তৎকালীন অন্যান্য সাময়িকী থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করেছিল।

'সংহতি'র সাংগঠনিক আদর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এর শ্রেণি সমন্বয় (Class Collaboration) নীতি। তখনকার দিনে যখন রুশ বিপ্লবের প্রভাবে শ্রেণি সংগ্রামের ধারণা তীব্র হচ্ছিল, 'সংহতি'র পরিচালক গোষ্ঠী তখন বুদ্ধিজীবী সমাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে একটি সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁরা মনে করতেন, আন্দোলনের চরমপন্থা অবলম্বন না করে আলোচনার মাধ্যমে ও নিজেদের দাবি সুসংহতভাবে পেশ করার মাধ্যমেই প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব। এই সাংগঠনিক দর্শনটি আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মনীষীদের আশীর্বচনে আরও পুষ্ট হয়েছিল।

এই ধারায় 'সংহতি' তার সাংগঠনিক কাঠামোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছিল যেখানে শ্রমিকরা কেবল পাঠক ছিলেন না, বরং ছিলেন আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার। এই সাংগঠনিক দৃঢ়তাই বিশের দশকের উত্তাল দিনগুলোতে পত্রিকাটিকে বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দিশারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।

তাত্ত্বিক অবস্থান: শ্রেণি সমন্বয় ও বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রভাব

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি কেবল রাজপথের লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এর পেছনে কাজ করেছিল এক গভীর তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন। 'সংহতি' পত্রিকার

তাত্ত্বিক ভিত্তির দিকে তাকালে দেখা যায়, এটি তৎকালীন বৈশ্বিক রুশ বিপ্লবোত্তর 'শ্রেণি সংগ্রাম' (Class Struggle)-এর উগ্র ধারণার পরিবর্তে এক বিশেষ ধরনের 'শ্রেণি সমন্বয়' (Class Collaboration)-এর আদর্শ দ্বারা পরিচালিত ছিল। তৎকালীন সমাজ-চেতন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, যাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার যুগে দিকনির্দেশক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের প্রতিফলন এই পত্রিকার পাতায় পাতায় লক্ষ্য করা যায়।

পত্রিকাটির আদর্শিক অবস্থান বুঝতে হলে এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল-এর আশীর্বাণীটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে, ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে কেবল বিরোধ বৃদ্ধি করা কোনো সংবাদপত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে, সমাজের এই দুই অপরিহার্য অঙ্গের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মেলবন্ধন ঘটানোই হওয়া উচিত 'সংহতি'র মূল ব্রত। এই 'শ্রেণি সমন্বয়' মতবাদটি তৎকালীন বাংলার উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মালিক পক্ষকে শত্রু হিসেবে না দেখে বরং তাঁদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

এই তাত্ত্বিক ভাবনার সমান্তরালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর চিন্তাধারাও 'সংহতি'র আদর্শকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া তাঁর বাণীতে রাজনৈতিক উত্তেজনার চেয়ে 'আত্মশক্তির' ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। তিনি শ্রমিকদের এই সত্যটি অনুভব করতে বলেছিলেন যে, সমাজের যন্ত্র-সভ্যতায় তাঁদের অপরিহার্যতা ঠিক কতখানি। রবীন্দ্রনাথের মতে, শ্রমিকরা যদি নিজেরাই নিজেদের শ্রমের মূল্য ও সামাজিক মর্যাদা বুঝতে পারে, তবেই তাঁরা শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবে। মালিকের বদান্যতা নয়, বরং শ্রমিকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনই ছিল তাঁর দর্শনের মূল কথা। এই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবের কারণেই 'সংহতি' পত্রিকা সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি না করে একটি স্বতন্ত্র নৈতিক অবস্থান বজায় রাখার চেষ্টা করত।

তবে এই 'শ্রেণি সমন্বয়'-এর তত্ত্ব কেবল ভাববাদী আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর একটি প্রয়োগিক দিকও ছিল। পত্রিকাটি বারবার প্রচার করত যে, পুঁজি ও শ্রমের বিরোধ মেটাতে হলে শ্রমিকদের শিক্ষিত ও সচেতন হতে হবে। মালিকরা যখন শ্রমিকদের অবহেলিত রেখে কেবল মুনাফা অর্জন করে, তখন পত্রিকাটি সেই শোষণের বিরুদ্ধে কলম ধরলেও সমাধানের পথ হিসেবে 'সন্ধি' বা 'সমন্বয়'-এর পথটিকেই শ্রেয় মনে করত। এই দর্শনের মূলে ছিল একটি সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা, যেখানে ধর্মঘট বা সংঘাত হবে শেষ অস্ত্র, প্রথম নয়।

গবেষণার নিরিখে দেখা যায়, তৎকালীন ভারতের চটকল বা শিল্পাঞ্চলগুলোতে যেখানে ইউরোপীয় মালিকদের শাসন চলত, সেখানে এই 'শ্রেণি সমন্বয়' তত্ত্বটি কতটা কার্যকর ছিল তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু 'সংহতি'র পরিচালক গোষ্ঠী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শ্রমিকদের হাতে কেবল মার্কসবাদী বিপ্লবের ধ্বজা তুলে দিলে তাঁদের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁদের জন্য প্রয়োজন লেবার কনশাসনেস (শ্রমিক চেতনা) এবং আইনি লড়াইয়ের জ্ঞান। এই তাত্ত্বিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই পত্রিকাটি 'শিল্প আইন' এবং শ্রমিকদের 'ন্যায্য দাবি-দাওয়া' নিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করত।

পত্রিকাটির তাত্ত্বিক অবস্থানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিল সমবায় আন্দোলন (Cooperative Movement)। তাঁরা মনে করতেন, পুঁজিবাদের বিপরীতে শ্রমিকদের একমাত্র রক্ষাকবচ হলো নিজেদের মধ্যে সংহতি স্থাপন করে সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা। অর্থাৎ, তাঁরা মালিকপক্ষের ওপর

চিরস্থায়ী নির্ভরশীলতা কাটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সংঘাতের পথে নয়, বরং গঠনমূলক বিকল্প গড়ে তোলার পথে। এই বিশেষ দর্শনটিই 'সংহতি'কে সমসাময়িক অন্যান্য বৈপ্লবিক বামপন্থী পত্রিকা থেকে আলাদা একটি তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিল।

তাত্ত্বিক সারসংক্ষেপ করতে গিয়ে দেখা যায়, বিশের দশকের এই সাময়িকীটি একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল। একদিকে যেমন চটকল মালিকদের অমানবিক শোষণের চিত্র তারা তুলে ধরত, অন্যদিকে দেশীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি সংঘাতহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখত। রুশ বিপ্লবের সেই উত্তাল সময়ে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে শ্রেণি সমন্বয়ের এই ডাক তৎকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকদের মধ্যে এক সেতুবন্ধন তৈরির বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা ছিল বললে ভুল হবে না।

শ্রমিক সংবাদ: সমসাময়িক আন্দোলনের জীবন্ত দলিল

'সংহতি' পত্রিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কেবল এর তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এর প্রতিটি সংখ্যা ছিল তৎকালীন বাংলার শিল্পাঞ্চল ও শ্রমিক জীবনের এক জীবন্ত দলিল। পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় 'আলোচনা' বা 'শ্রমিক সংবাদ' নামক বিশেষ বিভাগে সমসাময়িক ধর্মঘট, শ্রমিক সভা এবং চটকলগুলোর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, তা তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলে। এই সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পত্রিকাটি কেবল তাত্ত্বিক দিকনির্দেশনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং প্রতিটি ছোট-বড় আন্দোলনকে তারা জনসমক্ষে নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করত।

১৯২৩ সালের মে মাসে (১০ই বৈশাখ, ১৩৩০) 'সংহতি' পত্রিকায় একটি বিশেষ সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল হুগলি জেলে কারারুদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর জেল কর্তৃপক্ষের অমানবিক নির্যাতনের প্রতিবাদ। বিশেষ করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের দীর্ঘ অনশন ধর্মঘটের সংবাদটি পত্রিকাটি এমনভাবে প্রচার করেছিল যা সাধারণ শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রাজবন্দীদের এই নৈতিক লড়াইয়ের সাথে শ্রমিকদের স্বার্থকে একীভূত করে দেখা ছিল পত্রিকাটির একটি সাহসী পদক্ষেপ।

শিল্পাঞ্চলভিত্তিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'সংহতি'র দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। জামশেদপুরের টাটা কোম্পানির শ্রমিকদের আন্দোলনের খবর এর পাতায় নিয়মিত স্থান পেত। টাটা কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যখন শ্রমিকদের সভা-সমাবেশ করার মৌলিক অধিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং দমনমূলক আচরণ শুরু করে, তখন পত্রিকাটি এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। একইসাথে, ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে সান্তাহারে অনুষ্ঠিত 'ই. বি. রেল ভারতীয় কর্মচারী সভা'-র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। এই অধিবেশনে রেল শ্রমিকদের কাজের সময় নির্ধারণ এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় কর্মচারীদের মধ্যে বিদ্যমান বেতন বৈষম্য দূর করার যে দাবি তোলা হয়েছিল, 'সংহতি' তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভ সাজিয়েছিল।

চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের ক্ষেত্রেও পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। তথ্য অনুযায়ী, ১৯২৩ সালের মে ও জুন মাসের সংখ্যাগুলোতে চটকল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন অস্থিরতার খবর পাওয়া যায়। বিশেষ করে ভাটপাড়ার নিকটবর্তী 'গৌরীপুর চটকল', 'রিলায়েন্স' এবং 'নদীয়া চটকল'-এর শ্রমিক ধর্মঘটের কারণ ও ফলাফল নিয়ে পত্রিকাটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিল। নদীয়া চটকলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন ইউরোপীয় কর্মচারীর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে প্রায় তিন হাজার শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পত্রিকাটি এই সংবাদ

প্রকাশের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিল যে, শ্রমিকদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার লড়াই মজুরি বৃদ্ধির লড়াইয়ের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

পত্রিকাটির সংবাদ পরিবেশনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এর বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি। কেবল ধর্মঘটের খবর ছাপিয়েই তারা দায়িত্ব শেষ করত না, বরং সেই ধর্মঘট কেন ব্যর্থ হলো বা কেন সফল হলো, তা নিয়েও আলোচনা করত। নদীয়া চটকলের শ্রমিকদের একতা ও সাফল্যের প্রশংসা করে পত্রিকাটি লিখেছিল যে, শ্রমিকরা যদি নিজেদের 'সংহত শক্তি' বা সংগঠনের ওপর ভরসা রাখে, তবেই তারা কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের যোগ্য জবাব দিতে পারবে। এই সংবাদগুলো পরিবেশনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন প্রান্তের বিচ্ছিন্ন শ্রমিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটি সংহতি স্থাপন করা এবং তাদের মধ্যে একটি অভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো।

এছাড়াও, সমসাময়িক শিল্প-অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলোকেও সাধারণ শ্রমিকের বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা 'সংহতি'র পাতায় লক্ষ্য করা যায়। মজুরি নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা শ্রম আইনের মারপ্যাঁচ নিয়ে পত্রিকাটির আলোচনা বিভাগ ছিল তথ্যের খনি। তারা বারবার শ্রমিকদের মনে করিয়ে দিত যে, উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর শ্রমিকের কোনো আইনি অধিকার না থাকলেও, সেই দ্রব্য উৎপাদনের প্রধান চালিকাশক্তি হলো শ্রমিকের শ্রম। এই বোধটি তৈরির জন্য তারা দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের উদাহরণও নিয়মিত ব্যবহার করত।

তৎকালীন বঙ্গীয় আইন সভায় শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচনের বিতর্কিত বিষয়টিও 'সংহতি'র সংবাদ ও আলোচনা বিভাগে উঠে এসেছিল। তৎকালীন সরকার মনোনীত প্রতিনিধি কে. সি. রায় চৌধুরীর ভূমিকার সমালোচনা করে পত্রিকাটি দাবি করেছিল যে, শ্রমিকদের প্রতিনিধি নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার কেবল শ্রমিকদেরই থাকা উচিত। আমলাতান্ত্রিক কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই শ্রমিকরা যাতে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে, সেই লক্ষ্যে জনমত গঠনে পত্রিকাটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। এই সংবাদগুলো পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'সংহতি' কেবল একটি তথ্য সরবরাহকারী কাগজ ছিল না, বরং এটি ছিল ঔপনিবেশিক বাংলায় শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের এক অদম্য কণ্ঠস্বর।

এইভাবে 'সংহতি' তার সংবাদ ও আলোচনা বিভাগের মাধ্যমে সমসাময়িক ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিটি স্পন্দনকে ধরে রেখেছিল। টাটা কোম্পানির ব্যারিকেড থেকে শুরু করে হুগলি জেলের অনশন কিংবা চটকলের সাইরেন— সবই এই পত্রিকার পাতায় এক সুসংহত ইতিহাসের রূপ নিয়েছিল যা তৎকালীন শ্রমজীবী মানুষের লড়াইকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করে।

শ্রমিক অধিকার ও আইন সভার প্রতিনিধিত্ব: 'সংহতি'র রাজনৈতিক অবস্থান

ঔপনিবেশিক বাংলায় শ্রমিকদের কেবল কারখানার ভেতরে শোষিত হতে হতো না, বরং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্তরেও তাঁদের কণ্ঠস্বরকে অবদমিত করে রাখার এক সুসংগঠিত সরকারি প্রচেষ্টা জারি ছিল। 'সংহতি' পত্রিকা এই প্রশাসনিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তৎকালীন বঙ্গীয় আইন সভায় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি ছিল অত্যন্ত বিতর্কিত। এই বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারি বা আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ (Bureaucratic Interference)।

তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার আইন সভায় শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে যাদের মনোনীত করত, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা না করে সরকারের তাঁবেদারি করতেই ব্যস্ত থাকতেন। 'সংহতি' এই প্রথার তীব্র বিরোধিতা করে এক অটল নীতি ঘোষণা করেছিল। তাদের মূল দাবি ছিল— শ্রমিকদের প্রতিনিধি

শ্রমিকরাই সরাসরি নির্বাচন করবে এবং এই নির্বাচনি স্বাধীনতার ওপর সরকার কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এই দাবিটি ছিল তৎকালীন সময়ের নিরিখে অত্যন্ত প্রগতিশীল। পত্রিকাটির মতে, আমলাদের দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধি কখনোই শ্রমিকদের প্রকৃত দুঃখ-দুর্দশার কথা আইন সভায় তুলে ধরতে পারবেন না। এই রাজনৈতিক চেতনা থেকেই পত্রিকাটি প্রতিটি কারখানায় এবং শিল্পাঞ্চলে শক্তিশালী শ্রমিক সমিতি গড়ে তোলার ডাক দিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল তৎকালীন শ্রমিক নেতা কে. সি. রায় চৌধুরীর নাম। নথিতে দেখা যায়, 'সংহতি'র পরিচালক গোষ্ঠী কে. সি. রায় চৌধুরীর রাজনৈতিক ভূমিকার ঘোর বিরোধী ছিলেন। যদিও তিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত শ্রমিক সদস্য হিসেবে আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব করতেন, কিন্তু 'সংহতি'র দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী এক সুবিধাবাদী নেতা। কে. সি. রায় চৌধুরীর পুনর্নির্বাচনের বিরোধিতা করতে গিয়েই পত্রিকাটির পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয়েছিল যে, মনোনয়ন নয়, বরং ভোটাধিকারের মাধ্যমেই প্রকৃত প্রতিনিধি বাছাই করতে হবে। এই বিরোধটি কেবল ব্যক্তিগত ছিল না, বরং এটি ছিল দুটি ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে ছিল সরকার ঘেঁষা আপসকামী রাজনীতি, অন্যদিকে ছিল 'সংহতি'র প্রচারিত শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই।

পত্রিকাটির রাজনৈতিক দর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিল শ্রমিকদের আত্মমর্যাদাবোধ। তারা মনে করত, শ্রমিকদের মুক্তি কোনো 'বিখ্যাত ব্যক্তি' বা বাহিরের কোনো নেতার বদান্যতায় আসবে না। তৎকালীন সময়ে কোনো শ্রমিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলেই কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তার সভাপতি করার যে এক চিরাচরিত প্রথা চালু ছিল, 'সংহতি' তার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল— শ্রমিক সমিতি কেবল শ্রমিকদের দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। বাইরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ কেবল পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করতে পারেন, কিন্তু সংগঠনের চাবিকাঠি থাকতে হবে সাধারণ শ্রমিকের হাতেই। এই চিন্তাটি ছিল মূলত শ্রমিকদের স্বনির্ভরতা ও লেবার কনশাসনেস (শ্রমিক চেতনা) তৈরির প্রথম ধাপ।

শ্রমিকদের এই রাজনৈতিক সচেতনতাকে শক্তিশালী করতে 'সংহতি' তার পাতায় নিয়মিতভাবে শিল্প আইন (Labour Laws) সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করত। আইন সভায় কোন বিল পাশ হচ্ছে, সেটি শ্রমিকের স্বার্থে নাকি মালিকের সুবিধার্থে— এই বিশ্লেষণগুলো পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করত। তারা বিশ্বাস করত যে, শ্রমিকরা যদি আইনি ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হয়, তবে তাদের লড়াই কেবল মজুরি বৃদ্ধির গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। অথচ তাদের লড়াই হওয়া উচিত একটি শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে।

প্রবন্ধগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পরিচালক মণ্ডলীর মূল নীতি 'শ্রেণি সমন্বয়' হলেও অনেক সময় তারা সেই নীতির ঊর্ধ্বে উঠে মালিকপক্ষের দমননীতির তীব্র সমালোচনা করতেন। বিশেষ করে যখন কোনো ইউরোপীয় কর্মচারী ভারতীয় শ্রমিকের সাথে দুর্ব্যবহার করতেন, তখন পত্রিকাটির জাতীয়তাবাদী চেতনা শ্রমিক স্বার্থের সাথে একীভূত হয়ে যেত। তারা ঘোষণা করত যে, শ্রমিকের একমাত্র হাতিয়ার হলো তার 'সংহত শক্তি', যা সে সমিতি বা সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রামের কাজে প্রয়োগ করতে পারে।

এইভাবে 'সংহতি' পত্রিকা কেবল একটি তথ্য সরবরাহকারী কাগজ হিসেবে নয়, বরং শ্রমিকদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া ও অধিকার রক্ষার এক অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আইন সভায় আমলাতান্ত্রিক মনোনয়ন প্রথার বিরোধিতা এবং শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি নির্বাচনের সপক্ষে তাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচার বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। শ্রমিকদের

প্রতি এই অঙ্গীকারই পত্রিকাটিকে তৎকালীন সময়ের অন্যান্য সাময়িকীর চেয়ে স্বতন্ত্র এক রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রদান করে।

উপসংহার:

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে বাংলার উত্তাল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'সংহতি' পত্রিকা কেবল একটি গতানুগতিক শ্রমিক মুখপত্র হিসেবে নয়, বরং এক বহুমাত্রিক দর্পণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। যদিও এর প্রধান লক্ষ্য ছিল অবহেলিত শ্রমিক ও কর্মচারী শ্রেণিকে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, কিন্তু পত্রিকাটির বিষয়বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটি বৃহত্তর জাতীয় জীবনের নানা স্পন্দনকে ধারণ করত। পত্রিকাটির পাতায় শ্রমিক আন্দোলনের সংবাদের সমান্তরালে সমকালীন জাতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হতো। বিশেষ করে, হুগলি জেলে রাজবন্দীদের ওপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দমননীতি এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামের ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটের খবর যেভাবে এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছিল, তা প্রমাণ করে যে 'সংহতি' শ্রমিক স্বার্থকে তৎকালীন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই গণ্য করত।

শ্রমিকদের দৈনন্দিন লড়াইয়ের খবরের পাশাপাশি এই পত্রিকায় এক গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক চর্চার ধারাও বহমান ছিল। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নীতি ও বিষয়বস্তুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের আশীর্বাণী ও দর্শনের যে প্রতিফলন আমরা দেখি, তা ছিল মূলত এক ধরনের উচ্চতর সামাজিক চেতনা সৃষ্টির প্রয়াস। কেবল ধর্মঘট বা মজুরি বৃদ্ধির লড়াই নয়, বরং শ্রমিকদের রুচি ও মেধার বিকাশের জন্য সাহিত্য ও প্রবন্ধের নিয়মিত চর্চা ছিল এই সাময়িকীর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। শ্রমিকরা যাতে কেবল যান্ত্রিক উৎপাদক না হয়ে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই 'সংহতি' তার পাতায় সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব, স্বাস্থ্যবিধি এবং বিশ্ব অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলোকে অতি সাধারণ ভাষায় ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব নিয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, 'সংহতি'র তাত্ত্বিক কাঠামোতে 'শ্রেণি সমন্বয়'-এর আধিক্য থাকলেও এবং অনেক ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক ও সুবিধাবাদী শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বলয়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও, পত্রিকাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এটি প্রমাণ করেছিল যে, শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির এক সম্মিলিত রূপ। শ্রমিকদের নিজস্ব আত্মশক্তি ও সংগঠনের ওপর নির্ভর করার যে আহ্বান পত্রিকাটি ১৯২৩ সালে জানিয়েছিল, তা আজ শতবর্ষ পরেও আধুনিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসের এক আকর দলিল হয়ে রয়ে গেছে। বিশের দশকের সেই স্বল্পস্থায়ী কিন্তু আলোকোজ্জ্বল পথচলা বাংলার শ্রমজীবী মানুষের চেতনার ইতিহাসে 'সংহতি'কে এক কালজয়ী মর্যাদা প্রদান করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. পাল, জ্ঞানাঞ্জন ও বসু, মুরলীধর (সম্পা.)। সংহতি (১৩৩০ বঙ্গাব্দ/১৯২৩ খ্রি.), প্রথম বর্ষ, সংখ্যা ১-১২। পিরিওডিক্যালস বিভাগ, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১, ৩-৫, ৯-১১।

২. সরকার, মুকুন্দলাল (সম্পা.)। কর্মী (১৩২৮ বঙ্গাব্দ/১৯২১ খ্রি.), প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যা। 'এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন'-এর মুখপত্র, পৃষ্ঠা: ৪-৬।

৩. দেবী, সন্তোষ কুমারী (সম্পা.)। শ্রমিক (১৯২৪), প্রথম বর্ষের সংরক্ষিত সংখ্যাসমূহ। কলকাতা, পৃষ্ঠা: ২, ১২।

৪. চট্টোপাধ্যায়, গৌতম (সম্পাদনা)। সংহতি, লাঙল, গণবাণী। কলকাতা: কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ১৩-২৮ (এই গ্রন্থটি আপনার গবেষণার প্রধান আকর)।

৫. চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু। শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী ও তৎকালীন বাংলা। কলকাতা: মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা: ৪৫-৫৮।

৬. রায়, সুপ্রকাশ। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও শ্রমিক আন্দোলন। কলকাতা: ডিএনবি পাবলিশিং, সংস্করণ ১৯৭২, পৃষ্ঠা: ৩৮০-৩৯৫।

৭. সরকার, সুমিত। আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭)। দিল্লি: ম্যাকমিলান পাবলিশার্স, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা: ২০৫-২১৮।

৮. মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয়। বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস। কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, পৃষ্ঠা: ৯২-১০৫।

৯. চট্টোপাধ্যায়, সুরঞ্জন এবং দাশগুপ্ত, রতন। সাময়িক পত্রে শ্রমিক আন্দোলন (১৯২০-১৯৩০), পৃষ্ঠা: ১-১৫, (আর্কাইভালসংকলন)।

১০. জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা) সংরক্ষিত— রিপোর্ট অন নেটিভ নিউজপেপারস (বেঙ্গল), ১৯২১-১৯২৪ সময়কাল। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো নথিপত্র। (সংগ্রহ নং: ৪২/বি)।

১১. সেন, সুকোমল। Working Class of India: History of Emergence and Movement, 1830-1970। কলকাতা: কে.পি. বাগচী, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা: ১৫৪-১৬৮।

১২. গোস্বামী, ওমকার। Industry, Trade, and Peasant Capitalism: Agriculture and the Jute Capacity of Bengal, 1900-1947। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯১, পৃষ্ঠা: ১১০-১২৫। (চটকল ধর্মঘটের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের জন্য)।

১৩. দস্তীদার, সলিল। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ধারা। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, পৃষ্ঠা: ৭৪-৮৮।

১৪. 'প্রেস কর্মচারী সমিতি'-র বার্ষিক প্রতিবেদন ও সংরক্ষিত কার্যবিবরণী (১৯২১-১৯২৩), কলকাতা, (অধিবেশন রিপোর্ট: ৩)।

১৫. আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সংহতি' পত্রিকায় প্রকাশিত আশীর্বচন ও মূল প্রবন্ধের সংকলন, সংহতি, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩০; পৃষ্ঠা: ৩-৫।